মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক :
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী- ৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ২৪

১ম প্রকাশ

মার্চ ১৯৯৩ (যুবসংঘ প্রকাশনী)

২য় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ২০০৯ (হা.ফা.বা.)
ছফর ১৪৩০ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৫ বাং

নির্ধারিত মূল্য

১০ (দশ) টাকা মাত্র

NAITIK VITTI O PROSTABANA (Moral basis of the Movement & Proposals) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-ghalib**, Professor of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax: 88-0721-861365. Mob. 8801770-800900.

بسم الله الرحمن الرحيم

নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা

[১০ ও ১১ই সেপ্টেম্বর '৯২ রাজশাহী নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা এবং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের যৌথ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।]

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

প্রাণপ্রিয় সাথীবৃন্দ!

যে কোন আন্দোলন সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক কর্মপন্থা ও তা বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মীবাহিনী। এটা যেমন বাস্তব সত্য, তেমনি আরও সত্য হ'ল সর্বাগ্রে সেই আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে কর্মীদের সঠিক জ্ঞান হাছিল করা ও তা হৃদয়মূলে দৃঢ় বিশ্বাস আকারে গ্রথিত হওয়া। আন্দোলন সর্ম্পকে স্বচ্ছ জ্ঞান যার নেই, হৃদয়ে তার কোন আকুতি সৃষ্টি হয় না। আর যে আন্দোলন হৃদয় থেকে উত্থিত হয় না সে আন্দোলন কখনোই টিকে থাকতে পারে না। যত বড় বিদ্বান বা সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী কিংবা আন্দোলনের যে কোন স্তরের কর্মী তিনি হউন না কেন হৃদয়ের গভীরে আন্দোলনের শিকড় প্রোথিত না থাকলে দুনিয়াবী স্বার্থের সামান্য আঘাতেই তিনি আন্দোলন থেকে ছিটকে পড়বেন- এতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষণে আমরা দেখব আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি কি?

নৈতিক ভিত্তি

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। পরকালীন মুক্তির চেতনার উপরেই এই ভিত্তি স্থাপিত। আর এই চেতনা থেকেই মুমিন ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়ে জান-মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। অন্যকেও এই মহান আন্দোলনে

শরীক করার জন্য পাগলপরা হয়ে উঠেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সন্তুষ্টির বিনিময়ে দুনিয়ার সবকিছুকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে অবশ্যই ইসলামী চেতনা রয়েছে। কিন্তু সেখানে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের সম্মুখে তাক্বলীদে শাখছীর এক কঠিন পর্দা ঝুলানো রয়েছে, যা ছিন্ন করে সরাসরি ও নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করা তাদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দানের জন্য তাঁরা পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের নির্ধারিত উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইনসূত্র সমূহের আলোকে কুরআন-সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিংবা সম্পূর্ণ নতুন ভাবেই বিভিন্ন যুগের আলেমদের মাধ্যমে কিছু ব্যাখ্যা চালু হয়ে গেছে- যা তাঁদের অনুসারীগণ শরী'আত ভেবে পালন করে থাকেন। ফলে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের নামে সেখানে চালু হয়ে গেছে তাক্বলীদে ইমাম ও তাক্বলীদে অলি-র গোলক ধাঁধা। ইমামত ও বেলায়াতের পর্দা ছিন্ন করার মত সৎসাহস অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তেমন দৃষ্ট হয় না। আর সম্ভবতঃ সেই দুর্বলতা থেকেই তাঁরা বলতে বাধ্য হন যে, 'দেশে যে মাযহাবের লোকসংখ্যা বেশী, সে মাযহাব অনুযায়ী সেখানে শাসন ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক'। এটি একজন সাধারণ গণতান্ত্রিক নেতার বক্তব্য হ'লে শোভা পায়। কারণ গণতন্ত্রে অধিকাংশ জনগণের সমর্থন লাভই বড় কথা।

পক্ষান্তরে ইসলামী আন্দোলনে অধিকাংশের সমর্থন বা সন্তুষ্টি লাভের চাইতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। যা অনেক সময় অধিকাংশ লোকের অসন্তুষ্টির কারণ হ'তে পারে। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ কেবলমাত্র নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের উপরেই নির্ভর করে। আহলেহাদীছ আন্দোলন মুসলিম সমাজে তাক্বলীদে শাখছীর বদলে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জাযবা সৃষ্টি করে। বিদ্বানগণের উদ্ভাবিত উছূল বা আইন সূত্রের আলোকে কুরআন-সুন্নাহ্কে বিচার না করে এ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের আলোকে যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দানের জন্য প্রতি যুগের যোগ্য আলেমগণকে আহ্বান জানিয়ে থাকে।

আজকের পৃথিবীতে যে সকল সামাজিক সমস্যা বিরাজ করছে সম্ভবতঃ তার সবটাই পুরাতন সমস্যাবলীর নূতন রূপ। এই সকল সমস্যাবলী মুকাবিলা

করে আধুনিক পৃথিবীকে শান্তির পৃথিবীতে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন মতাদর্শের সমাজ বিজ্ঞানী ও সমাজ নেতাগণ তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাথে সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাও প্রয়োগ করছেন। কিন্তু উন্নত ও উন্নয়নশীল নামে বিভক্ত বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই প্রকৃত অর্থে সামাজিক শান্তি নেই বললেই চলে। এর কারণ হিসাবে বলা চলে যে, প্রত্যেক দেশের নেতৃবৃন্দ তাদের স্ব স্ব চিন্তাধারার আলোকে সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেহেতু মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে কেউ-ই নন, তাই আইন রচনার সময় যেমন দুর্বলতা থেকে যায়, আইন প্রয়োগের সময় দেখা দেয় আরো বেশী গা বাঁচানোর প্রচেষ্টা।

বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষমতা হারানোর পরে যে সকল রাষ্ট্রপ্রধান বছরের পর বছর কারা ভোগ করছেন কিংবা বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছেন, তারা ক্ষমতায় থাকাকালে বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ করেছেন। আইনের যেসকল ধারা ক্ষমতা হারানোর পরে তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয়েছে, ক্ষমতায় থাকাকালে কিন্তু তা প্রয়োগ করা হয়নি। এইভাবে সরকারী দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে সমাজ বিরোধী দুর্নীতিবাজরা দোর্দণ্ড প্রতাপে ভদ্র মুখোশে তাদের নোংরা উদ্দেশ্যসমূহ বাস্ত বায়ন করে গেছে বা এখনও যাচ্ছে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের হোতারাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেওয়ালে লিখে ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাস্তায় মিছিল করে। আইয়ামে জাহেলিয়াতের গোত্র-দ্বন্দ্ব আজকের বিশ্বে রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে।

প্রাচীনকালে ইহুদী-নাছারাদের সমাজে নেতৃস্থানীয় লোকদের অপরাধকে যেমন ঢাকা দেওয়া হ'ত, আজকের সমাজে তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অপরাধকে আড়াল করার যাবতীয় প্রচেষ্টা চালানো হয়। সে যুগের সমাজ নেতারা যেমন সংশোধনের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন, আজকের সমাজ নেতারাও তেমনি ব্যর্থ হচ্ছেন। কারণ আইন রচনা ও আইন প্রয়োগ দু'টি ব্যাপারেই সকলে সর্বদা নিজেদের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর নিজেদের রচিত আইনের পিস্তল নিজেদের বক্ষ ভেদ করুক, এটা কেউ-ই কামনা করেন না।

আদম (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী ও রাসূল তাই যুগে যুগে মানব জাতিকে আল্লাহ্র আইন অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। যেহেতু আইন মান্য করার প্রধান শর্ত হ'ল আনুগত্য, সেকারণ আল্লাহ্র নবীগণ সর্বাগ্রে মানবজাতিকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। দুর্ভাগ্য এই যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন এলাহী ধর্মের অনুসারী হবার দাবীদার হ'লেও বলা চলে যে, প্রায় সকলেই বিশেষতঃ মুসলিমগণ ইসলাম ধর্মের সামাজিক ও বৈষয়িক দিককে অগ্রাহ্য করে চলেছেন। ধর্মীয় দিকেও ঘটিয়েছেন কমবেশী বিকৃতি। বৈষয়িক স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং আক্বীদাগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফাঁক-ফোকর দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক স্থায়ী ফিক্বহী ও উছূলী ফের্কাবন্দী। কুরআন ও সুন্নাহ্র পবিত্র সলিলে প্রকারান্তরে নিজেদের রায় ও দৃষ্টিভঙ্গিই মিশ্রিত হয়েছে ও তা প্রাধান্য পেয়েছে জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

বর্তমান যুগের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইসলামের বৈষয়িক দিকটিকে বাদ দিয়ে সেখানে নিজেদের স্বার্থদুষ্ট সিদ্ধান্ত সমূহ আইনের নামে জনগণের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি ধর্মীয় দিকটিকেও একদল আলেম নিজেদের মনের মত করে তৈরী করে নিয়েছেন। এভাবে ক্রমেই মুসলিম সমাজ এগিয়ে চলেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে যেখানে তিনি বলেছেন যে, 'আমার উম্মতের উপর অবশ্যই অনুরূপ অবস্থা আসবে, যেরূপ এসেছিল বনু ইস্রাঈলের উপর একজোড়া জুতার পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ন্যায় ...'।[১]

১ম শতাব্দী হিজরীর প্রথম ভাগে তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (২৩-৩৫ হিঃ) ও চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (৩৫-৪১ হিঃ) রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমার সময়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে মুসলমানদের মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল বিদ'আহ নামে দু'টি ধারার সৃষ্টি হয়। যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়। অতঃপর তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষদিকে এসে 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়' নামে আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণ স্পষ্টতঃ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যান। আহলুল হাদীছগণ তাদের সকল আদেশ-নিষেধের ভিত্তি রাখেন সরাসরি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে। পক্ষান্তরে আহলুর রায়গণ ভিত্তি রাখেন তাঁদের রচিত বিভিন্ন

---

১. *আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৭২, সনদ ছহীহ।*

ফিক্বহী মূলনীতি বা উছূলে ফিক্বহের উপরে। উছূল বা আইনসূত্র সমূহের আলোকে রায়পন্থী ফক্বীহগণ কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। উছূলের প্রতিকূলে কোন ছহীহ হাদীছ প্রাপ্ত হ'লে তাঁরা উক্ত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেন বা দূরতম ব্যাখ্যা (তাবীল) করেন, যা মূলতঃ অপব্যাখ্যার শামিল। এভাবে উক্ত দু'দলের ইবাদত ও মু'আমালাত তথা আক্বীদা ও আমলে ঘটে যায় ব্যাপক তারতম্য।

পরিণতি : জান্নাত পিয়াসী একজন মুমিন এই পার্থক্য বুঝতে পেরে যখন নিজ মাযহাবের আলেমদের রচিত ফিক্বহী সিদ্ধান্তের বদলে ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দিয়ে 'আহলুল হাদীছ' হয়ে যান, তখনই তার উপরে নেমে আসে অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টীম রোলার। বাপ-মা ভাই-বোন পর্যন্ত তাকে বয়কট করেন। তিনি হন সমাজচ্যুত। রাষ্ট্রীয়ভাবেও তিনি অঘোষিত বয়কটের শিকার হন। বাংলাদেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত জাতীয় মসজিদ ঢাকার বায়তুল মুকাররমে কিংবা বাংলাদেশের বিভিন্ন অফিস-আদালত বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বা হল সমূহের মসজিদে কোন আহলেহাদীছ ইমাম বা খত্বীবকে নিয়োগ দেওয়া হয় না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ধর্মীয় উপদেষ্টা পদে কয়েকজন আহলেহাদীছ তরুণ আলেম নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে পরে তাতে উল্লেখিত বিভিন্ন বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির দায়িত্ব পালনের শর্ত দেখে অতি সাধের চাকুরী ছেড়ে চলে এসেছেন স্রেফ ঈমান বাঁচানোর তাকীদে এমন দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। কেন এই বয়কট, কেন এই বঞ্চনা? একটাই অপরাধ যে তিনি 'আহলেহাদীছ'। অনাহারক্লিষ্ট পিতা-মাতার একমাত্র নয়নমণি, নববিবাহিতা তরুণী স্ত্রীর প্রেমের পুত্তলী, সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম যুবক স্বামী এত সুন্দর চাকুরী পেয়েও অবলীলাক্রমে তা ছেড়ে এসে বেকারত্বের দহন জ্বালা বরণ করে নেন কোন তাকীদে? তাকীদ তো কেবল একটাই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী শান্তির বিনিময়ে তিনি চান কুরআন-হাদীছের সনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমে চিরস্থায়ী পরকালীন মুক্তি হাছিল করতে। এই ঈমানী জাযবাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও অজেয় নৈতিক শক্তি।

দক্ষিণ এশিয়ায় পরিচালিত সোয়াশো বছর ব্যাপী জিহাদ আন্দোলন (১৮১৬-১৯৫১), সৈয়দ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০/১৮০৫-

১৯০২ খৃঃ) পৌনে এক শতাব্দীকাল ব্যাপী (১২৪৬-১৩২০ হিঃ) শিক্ষা আন্দোলন, সৈয়দ ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ) ৩৭ বৎসর ব্যাপী (১২৭০-১৩০৭ হিঃ) লেখনী যুদ্ধ ছিল মূলতঃ উক্ত চেতনা থেকেই উৎসারিত। ১৮৯৫ সালে দিল্লীতে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনে যে সাংগঠনিক যুগের সূচনা হয় এবং যা বিগত প্রায় এক শতাব্দী কাল যাবত অব্যাহত রয়েছে, তারও অন্তর্নিহিত প্রেরণা একটাই- আমরা মানব রচিত প্রাচীন বা আধুনিক কোন মাযহাব, তরীক্বা, ইজম বা মতবাদের অন্ধ অনুসারী নই বরং ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা হ'তে চাই স্রেফ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ ও একনিষ্ঠ অনুসারী 'আহলুল হাদীছ'। আজও যারা তাদের বাপ-দাদার লালিত মাযহাব ছেড়ে আহলেহাদীছ হচ্ছেন এবং প্রতিনিয়ত পারিবারিক ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কোন দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য নয়; বরং স্রেফ আল্লাহ্কে রাযী-খুশী করার জন্য পরকালীন স্বার্থেই আহলেহাদীছ হচ্ছেন এবং আগামীতেও হবেন ইনশাআল্লাহ।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন : তুলনামূলক আলোচনা

বন্ধুগণ!

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন মূলতঃ একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে জিহাদ আন্দোলনের সময়ে এটি সামগ্রিক সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর ভারতের পাক-আফগান সীমান্ত এলাকা ও পূর্ব ভারতের বিহার ও বাংলা এলাকার মুসলমানেরাই জিহাদ আন্দোলনে অধিকহারে অংশ নেন। ফলে এই এলাকায় আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা অন্যান্য এলাকার তুলনায় অধিক। যার মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলেই আহলেহাদীছের জনসংখ্যা সর্বাধিক। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সাথে সাথে এই অঞ্চলের আহলেহাদীছ মুজাহিদগণ দখলদার ইংরেজ কুফরী শাসনের বিরুদ্ধে জানমাল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পক্ষান্তরে অলস বিদ‘আতী আলেম ও তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলমানেরা যেমন তাদের গৃহশত্রু ছিল, তেমনি বৃটিশের অনুগ্রহপুষ্ট বহু আলেম ও মুসলিম নেতা তাদের রাজনৈতিক শত্রু ছিলেন। ফলে মুষ্টিমেয় জিহাদীদের মাধ্যমে তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন না হ’লেও তারাই যে ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসেনা, এতে বিদ্বানগণের মধ্যে কারুরই কোন দ্বিমত নেই।

ভারতের এই প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী কারা ছিলেন? উইলিয়াম উইলসন হান্টার উপমহাদেশের হিন্দুদেরকে এবং বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে সুন্নী ও শী‘আদেরকে এ ব্যাপারে চিহ্নিত করেছেন।[২] ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের নিকটে ‘ওয়াহ্হাবী’রা নিশ্চয়ই সুন্নী ছিলেন না। বরং সুন্নী তারাই যারা আজও বাংলাদেশে ‘সুন্নী’ হিসাবেই পরিচিত। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২১৫-১২৯০/১৮০০-১৮৭৩ খৃঃ) যিনি প্রথম দিকে জিহাদ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ আল্লামা শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১)-এর আক্বীদা ও আমলের বিরোধী হওয়ার কারণে পরবর্তীতে জিহাদ বিরোধী ফৎওয়া দিতে শুরু করেন। তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে ‘দারুল ইসলাম’ ফৎওয়া দেন এবং ফাতাওয়া আলমগীরীর বরাত দিয়ে বলেন ‘এখন কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তি যদি হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভারতের শাসক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে সে যুদ্ধকে ‘বিদ্রোহ’ বলে অভিহিত করাই সঙ্গত হবে। মুসলমানী আইনে বিদ্রোহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং .. কেউ যদি অনুরূপ যুদ্ধ শুরু করে, তবে মুসলমান প্রজারা তাদের শাসককে সাহায্য করতে এবং শাসকের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ফতোয়া-ই-আলমগীরীতে স্পষ্টাক্ষারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৩] উক্ত ফৎওয়ার সারকথা হ’ল, এখন সকলকে ইংরেজদের সঙ্গে মিলে ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিৎ’। তাঁর এই ফৎওয়ায় খুশীতে গদগদ হয়ে হান্টার তাকে প্রশংসা করে বলেন, এটা অতীব আনন্দের বিষয় যে,

---

২. *দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স (বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ৮৬।*

৩. *১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর, কলিকাতা মোহামেডান ল’ সোসাইটির সিদ্ধান্ত; দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স (অনু) পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।*

... বিদ্রোহ করার ফৎওয়াটি যে যেলা থেকে ঘোষিত হয়েছিল, সেই যেলাতে এখন একজন মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ (মৌলবী কারামত আলী-টীকা) জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিরুদ্ধে জোরালো সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন'। হান্টার আরও বলেন, 'আইন ও শাস্ত্রকারদের যেমন রাজানুগত্য প্রদর্শনের কাজে তেমনি রাজদ্রোহের প্রয়োজনেও সমানভাবে ব্যবহার করা যায়'।[৪]

একইভাবে দিল্লীর খ্যাতনামা আলেম ও মুজাহিদ নেতা মৌলভী মাহবূব আলী দেহলভী সীমান্তের পাঞ্জতার মুজাহিদ ঘাঁটি পর্যন্ত গিয়ে জিহাদকে বিদ্রুপ করে মুজাহিদগণকে প্ররোচিত করেন ও একদল মুজাহিদকে দিল্লীতে ফিরিয়ে আনেন। শুধু তাই নয়, যাতে কেউ আর জিহাদ আন্দোলনে সহযোগিতা না করে, কোন রসদপত্র ও লোকজন সীমান্তে যেতে না পারে, তারও ব্যবস্থা করেন। তার এই বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা জিহাদ আন্দোলনের যে ক্ষতি হয়েছিল, মৌলবী জাফর থানেশ্বরী ও জীবনীকার মির্যা হায়রাত দেহলভীর মতে ঐ ধরনের মারাত্মক ক্ষতি আর কারও দ্বারা হয়নি। ইসলামী জিহাদের জান্নাতী ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতা তাই একটি চিরন্তন সমস্যা।

শাহ ইসমাঈলের সেনাপতিত্বে সীমান্তে প্রধান যে তেরটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার মধ্যে ৩/৪টি ছাড়া বাকী সবগুলোই ছিল স্থানীয় বিশ্বাসঘাতক পাঠান ও দুররানী বাহিনীর বিরুদ্ধে। এমনকি বালাকোট বিপর্যয়ের জন্যও দায়ী ছিল এইসব কথিত মুসলিম নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা। সর্বশেষ ১৮৬৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সংঘটিত ঐতিহাসিক আম্বেলা যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি চেম্বারলীনের নেতৃত্বে ১০,০০০ অমুসলিম সৈন্য ছাড়াও স্থানীয় বিশ্বাসঘাতক ছয়টি মুসলিম গোত্রের যোদ্ধা সংখ্যা ছিল ৬৪,২৫০ জন। ঘুষ ও কুটনীতির মাধ্যমে তারা রাতারাতি ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত পৌনে এক লক্ষ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ অস্ত্রের অধিকারী ভূখা-নাঙ্গা, গাছের ছাল-পাতা খেয়ে বেঁচে থাকা বারো থেকে চৌদ্দ শ' মুসাফির মুজাহিদদের এই অসম যুদ্ধে ২৩৮ জন ইংরেজ অফিসার সহ মোট ৩,০০০ শত্রু সৈন্য নিহত হয় এবং ৪০০ মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন।

---

৪. *দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স (বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ৯১, ১০৪।*

এই বারো/চৌদ্দশো মুজাহিদের ১০টি প্লাটুনের ৯টি প্লাটুনই ছিল বাঙালী মুজাহিদদের। খোদ আমীর আব্দুল্লাহ (ইমারত কালঃ ১৮৬২-১৯০২) যে 'জামা'আতে আব্দুল গফূর'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারা সবাই ছিলেন বাঙ্গালী। অমনিভাবে শাহ ইসমাঈলের নেতৃত্বে সীমান্ত জিহাদের ২য় যুদ্ধে (বাযার যুদ্ধ সম্ভবতঃ ১৮২৭-এর জানুয়ারীতে) প্রথম শহীদ ছিলেন বরকতুল্লাহ বাঙ্গালী। বলা অনাবশ্যক যে, স্থানীয় পাঠান সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা ও লোভী চরিত্রই ছিল জিহাদ আন্দোলনে এই সব বাহ্যিক বিপর্যয়ের মূল কারণ। গবেষক আব্দুল মওদূদ বলেন, 'কালক্রমে (এই সব) বাঙ্গালী জিহাদীরা আহলেহাদীছ, লা-মাযহাবী, মুওয়াহহেদ, মুহাম্মদী, গায়ের মুক্বাল্লিদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছিল। ... আর এর সংগঠন পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল এ যুগের ধিকৃত ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম সমাজ'।[৫]

আব্দুল মওদূদ বর্ণিত শহীদায়েন পরবর্তী সেই আলেম সমাজ ছিলেন বাংলা, বিহার ও সীমান্তে যুদ্ধের ময়দানে বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও তাঁদের অনুসারী অধিকাংশ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম। খানক্বাহ, দরগাহ ও আস্তানার নিরুপদ্রব কক্ষগুলির আরাম-আয়েশ যাদেরকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। তীজাঁ, দস্ওয়াঁ কুলখানি, চেহলাম, ওরস, মীলাদ, ঈছালে ছওয়াব, শবেবরাতের আলোকসজ্জা ও হালুয়া-রুটির লোভনীয় আকর্ষণ যাদেরকে বেঁধে রাখতে পারেনি। জীবন বাজী রেখে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মায়াবন্ধন ছিন্ন করে তারা হাযার হাযার মাইল দূরে সীমান্তের পাঞ্জতার, সিত্তানা, মুল্কা, আসমাস্ত ও চামারকান্দের মুজাহিদ ঘাঁটিগুলিতে চলে গিয়েছিলেন জনমের মত হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাতের অমিয় সুধা পানের উদগ্র বাসনা নিয়ে। আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী প্রমুখ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ সে যুগেও যেমন একশ্রেণীর আলেম ও তাদের অনুসারীদের নিকটে ধিকৃত ছিলেন, এ যুগের হক্বপন্থী আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামও তেমনি একশ্রেণীর ওলামার নিকটে ধিকৃত হয়েই আছেন।

---

৫. *আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, পৃঃ ১০০, ১০১ ।*

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সকল অঞ্চলে কমবেশী আহলেহাদীছ-এর বসবাস থাকলেও বালাকোট পরবর্তী শতবর্ষ ব্যাপী জিহাদ আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি এলাকা হওয়ার কারণে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য সকল এলাকার তুলনায় আজও বেশী। এটা যে জিহাদ আন্দোলনেরই বাস্তব ফল, তা বলা যেতে পারে।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালে ইসলামের নামে স্বাধীন পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার ফলে জিহাদ তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য হাছিল হয়। এরপর থেকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরাম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দু'টি 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' গঠন করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০ খৃঃ) এবং 'পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর সভাপতি মাওলানা দাঊদ গযনবী (১৮৯৫-১৯৬৩ খৃঃ) উভয়েই অত্যন্ত যোগ্য আলেম ও রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও দু'টি জমঈয়তকেই তাঁরা রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে দূরে রাখেন। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই হয়তবা তাঁরা আহলেহাদীছদের স্বার্থ রক্ষিত হবে ভেবেছিলেন। তাছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খৃঃ), মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮৮৬-১৯৫২ খৃঃ), মাওলানা দাঊদ গযনবী (১৮৯৫-১৯৬৩ খৃঃ), সকলেই ছিলেন মুসলিম লীগের অত্যন্ত প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় নেতা। তাঁরা আজ সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। মুসলিম লীগও আজ মৃতপ্রায়। দেশে এখন গড়ে উঠেছে আদর্শ ভিত্তিক ডান বাম অসংখ্য রাজনৈতিক দল।

ইসলামী আদর্শের দাবীদার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি দলের সম্মানিত আমীর ইতিপূর্বে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন 'দেশে যে মাযহাবের লোকসংখ্যা বেশী, সে মাযহাব অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বিবাহ তালাক...'।[৬] তাঁর এই বক্তব্য তাঁর দলেরই মতামত

৬. *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৬।*

বলে ধরে নেওয়া চলে। কেননা এর বিরুদ্ধে উক্ত দলের পক্ষ হ'তে গত অর্ধযুগের মধ্যেও কোনরূপ বক্তব্য এসেছে বলে জানা যায়নি।

এক্ষণে **প্রথম প্রশ্ন :** আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থ কি? উত্তরে বলব যে, স্বার্থ একটাই দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ঢেলে সাজানো।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : উক্ত স্বার্থ অন্য কোন সেক্যুলার বা ইসলামী রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে হাছিল করা সম্ভব কি? এক কথায় এর উত্তর- না। কারণ সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো ইসলামী শাসন চান না। অন্যদিকে যারা ইসলামী শাসন চান, তারা নিজ মাযহাবী সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে গিয়ে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ধর্মীয় ও বৈষয়িক বিধি-বিধান সমূহকে প্রতিনিয়ত এড়িয়ে চলেন। এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা আর যাই হোক আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিল হ'তে পারে না। বৃটিশ আমলে আহলেহাদীছদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যালেম শিখ ও ইংরেজ শাসন হটানো এবং সাথে সাথে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা। যা তাঁরা করেছিলেন ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে সীমান্তের শিখ দূর্গ ফতহ্গড় জয়ের মাধ্যমে। পরে নামকরণ করা হয় 'ইসলামগড়'। যার সীমান্ত ছিল নওশেরাঁ হ'তে সিকান্দারপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছে আফগানিস্তানের নূরিস্তান ও কুনাড় প্রদেশে। আজকে আমাদের উদ্দেশ্য কেবল একটাই যে, আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালিত হৌক।

আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে আহলেহাদীছরা একটি নির্জীব ধর্মীয় ফের্কায় পরিণত হয়েছে। ছালাতে আমীন বলা ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করা এবং শিরক ও বিদ'আত বিরোধী একটা মনোভাব ছাড়া যার আর তেমন কিছু বাকী নেই। অথচ দেড়শত বৎসর পূর্বে এই বাংলাদেশে আহলেহাদীছের যে জনসংখ্যা ছিল আজকে তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক গুণ বেশী। কিন্তু সে যুগের সেই কঠিন বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তাদের ভিতরে যে জিহাদী জাযবা ছিল, আজ তার এক শতাংশ বাকী আছে কি? যদি বলি নেই তবে সেটাও সর্বাংশে ঠিক হবে না। বরং এটাই ঠিক যে, তারা আজ চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়েছে আদর্শিক স্বাতন্ত্র্যবোধ। তাদের অনেক আলেমের মুখে এখন 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলে বক্তব্য শুনতে পাওয়া যায়। একটি

তাক্বলীদপন্থী দলকে খাঁটি ইসলামী দল বলে তাদের কাউকে বই লিখতেও দেখা যায়। যে খৃষ্টান শাসকদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছরা একসময় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আজ সেই খৃষ্টান শক্তি বা তাদের অনুসারীদের পাঠানো ইসলামবিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের শ্লোগান আহলেহাদীছ তরুণদের মুখ দিয়েই বের হচ্ছে। ছুঁড়ে ফেলা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামী পরোক্ষভাবে আবার চেপে বসেছে তাদের গর্দানে।

আহলেহাদীছদের এই করুণ অবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর জন্য কয়েকটি বিষয় দায়ী বলে আমরা মনে করি। (১) পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে আহলেহাদীছ আক্বীদার আলোকে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ফলে যোগ্য আহলেহাদীছ আলেমের দুঃখজনক অভাব সৃষ্টি হয়েছে। (২) প্রচলিত মাযহাবী ফিক্বহ অনুযায়ী আলিয়া নেছাবের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী আনুকূল্য লাভের ফলে চাকুরী-বাকুরীর বাস্তব প্রয়োজনে প্রতিভাবান আহলেহাদীছ ছাত্ররা আলিয়া নেছাবের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফলে নিরপেক্ষভাবে কুরআন-সুন্নাহ্র ইল্ম থেকে তারা বঞ্চিত হয়। (৩) স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে আহলেহাদীছ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া হয়নি। (৪) আহলেহাদীছ আক্বীদার আলোকে বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় লেখনীর অভাব। (৫) জনমত গঠনের জন্য যোগ্য ও যুগোপযোগী বক্তার অভাব। (৬) রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে দূরে অবস্থান করা।

প্রস্তাবনা

এক্ষণে এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সুদূরপ্রসারী ও দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে ময়দানে নামতে হবে। এ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-ভাবনা প্রস্তাব আকারে আপনাদের সামনে পেশ করছি। (১) কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ গবেষণার জন্য আহলেহাদীছদের পরিচালনাধীনে 'বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (২) মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে আহলেহাদীছ আক্বীদার বইসমূহ সংযুক্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সহ মাদরাসা সিলেবাস সমূহকে যুগোপযোগী করতে হবে, যেন সাধারণ শিক্ষার জন্য ছাত্রদেরকে পৃথক কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে না হয়। মেয়েদের জন্য পৃথক মাদরাসা কায়েম করতে হবে। অথবা

একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৩) আহলেহাদীছ পরিচালিত একাধিক দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকপত্র সমূহ বের করতে হবে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য লেখক সৃষ্টির ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে আহলেহাদীছ পরিচালিত মাদরাসাগুলি তাদের সাময়িক মুখপত্র বের করে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও যোগ্য ইমাম ও খত্বীব এবং বক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে (৪) উদারভাবে ব্যাপক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম চালু করতে হবে ও তার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আক্বীদার প্রতি সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। (৫) রাজনৈতিক অঙ্গনে আহলেহাদীছ-এর সক্রিয় পদচারণা থাকতে হবে এবং 'ইসলামী খেলাফত' কায়েমের লক্ষ্যে জনমত সংগঠিত করতে হবে।

বর্তমান যুগের প্রচলিত দলবাজি রাজনীতির রঙিন চশমা দিয়ে আহলেহাদীছ-এর রাজনীতিকে বিচার করলে ভুল হবে। কেননা ইসলামী রাজনীতির লক্ষ্য হ'ল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া। এজন্য সবার আগে অহি-র বিধানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা আবশ্যক। কেননা সমাজের মৌলিক পরিবর্তন হয়ে থাকে জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে। নবী-রাসূলগণ সর্বদা সে পরিবর্তনের দিকেই জোর দিয়েছেন। কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। সেকারণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' প্রথমে মুমিনের ব্যক্তি জীবনকে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে গড়ে তুলতে চায়। সাথে সাথে তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পরিবর্তন কামনা করে। ছালাত আদায়ের সময়ে তিনি ছহীহ হাদীছ অনুসরণ করবেন, অথচ রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিগত কোন একজন নির্দিষ্ট ফক্বীহ-ইমাম বা আধুনিক কোন চিন্তাবিদ-দার্শনিকের অন্ধ অনুসরণ করবেন, এটা প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নেতৃত্বকে অসম্পূর্ণ মনে করার শামিল।

মানুষের জীবনসত্তা অখণ্ড ও অবিভাজ্য। সেকারণ আহলেহাদীছগণ মুমিনের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের জন্য দু'জন রাসূল কামনা করেন না। বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেই মাত্র 'উসওয়ায়ে

হাসানাহ’ বা উত্তম নমুনা বলে তারা বিশ্বাস করে থাকেন। এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ কোন অবস্থাতেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী শাসন কামনা করেন না। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হেদায়াত অনুযায়ী মুসলমানদের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা সামাজিক শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে তারা আবশ্যিক মনে করেন। কোনরূপ বিদ্রোহ, সন্ত্রাস বা ভাংচুরের রাজনীতি তারা আদৌ সমর্থন করেন না। তারা বিশ্বাস করেন যে, জনগণের চিন্তাধারা তথা আক্বীদায় বিপ্লব আনার মাধ্যমেই প্রকৃত সমাজ বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। আর সেই স্থায়ী বিপ্লবের লক্ষ্যেই দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ-এর সোচ্চার বক্তব্য ও সক্রিয় পদচারণা থাকতে হবে। বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে নয়, বরং বাতিলের মুকাবিলা করেই সেটা করতে হবে।

বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ-এর আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য এবং সাথে সাথে যৌবনের উদ্যমকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্রোতধারায় পরিচালিত করার জন্য ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর পদযাত্রা শুরু হয়। যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু পথভোলা তরুণ আজ ঘরে ফিরেছে ও আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছে। তাদের মধ্যে জাগরণ এসেছে ও সেই সাথে জেগে উঠেছেন অনেক চিন্তাশীল সুধী ও বিদগ্ধ মুরব্বিয়ান। আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক মানুষের নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ’ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।